# বাংলাদেশের বর্জ্যজীবি নারী ও শিশুদের অমানবিক পরিস্থিতি

**এ কে এম মাকসুদ**
**গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি**
*grambangla@yahoo.com*

(এই প্রবন্ধটি রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস, বাংলাদেশ এবং গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির যৌথ আয়োজনে "বাংলাদেশের বর্জ্যজীবি নারী ও শিশুদের অমানবিক পরিস্থিতি" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। প্রবন্ধটি ঢাকার বর্জ্যজীবিদের উপর পরিচালিত একটি একশন রিসার্চ এবং বাংলাদেশে বর্জ্যজীবিদের পরিস্থিতি জানার জন্য পরিচালিত আরও একটি গণগবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। গবেষণা কর্ম দুটি ২০০৮ থেকে ২০১০ সময়কালে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশের সহায়তায় জনাব এ কে এম মাকসুদ এবং জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান মোলণ্ডা কর্তৃক পৃথকভাবে পরিচালিত হয়েছিল।)

**৯ জানুয়ারী ২০১১**

## সংক্ষিপ্তসার

*বর্জ্যজীবিরা শহরের ডাষ্টবিন ও ডাম্পিং সাইট বা ল্যান্ডফিল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ পেশাটি হলো শহরের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুর"ষদের আয় করার একটি পেশা। বর্জ্যজীবিরা উচ্ছিষ্ট খাবার, কাগজ, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর বর্জ্য, টিন ও টিনজাত দ্রব্য, ভাঙ্গা কাঁচ, লোহার টুকরা, কাঠ, জুতা-স্যান্ডেল, ব্যবহারের করা সিরিঞ্জ, রক্ত ও স্যালাইনের ব্যাগ, পণ্যাষ্টিক বোতল ও প্লাষ্টিকজাত দ্রব্য, এক্সরে প্লেট, পলিথিন, রাবারের সামগ্রী, হাড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে।*

*গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, দেশের প্রায় চার লাখ মানুষ বর্জ্য সর্ম্পকিত জীবিকার সাথে জড়িত। ক্ষতিকর ও দূর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য সংগ্রহ, ঠিক জায়গামত নিয়ে ফেলা এবং রিসাইক্লিং-এ এসব মানুষদের অবদান অসামান্য। প্রতিদিন ঢাকার ২টি ডাম্পিং সাইট বা ল্যান্ডফিলে এবং ২০০০ টি ডাষ্টবিনে আনুমানিক ৪৫০০ টন বর্জ্য ফেলা হয়। দেশের শহরগুলোর ডাষ্টবিনে ও ওয়েষ্ট ডাম্পিং সাইটগুলোতে এখন গড়ে দৈনিক ২৭,০০০ টন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে এবং ১০,০০০ এর বেশী ডাষ্টবিন রয়েছে এবং কমপক্ষে ৭০টি ডাম্পিং সাইট রয়েছে। সব পৌরসভা বা উপজেলা শহরগুলোতে এখনও বর্জ্য ফেলার স্থান নির্দিষ্ট করা যায়নি।*

*বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত নারী-পুর"ষরা শিশুদের সাথে না রাখতে চাইলেও কোন বিকল্প ব্যাবস্থা তাদের নেই কারন তারা যখন ডাম্পিং সাইটে আসে তখন তাদের ঘরে শিশুদের দেখাশোনা করার কেউ থাকেনা। তাই বর্জ্যজীবি মায়েদের ঐ ২-৩টি শিশুসহই ভোর ৫টার মধ্যে বর্জ্য কুড়ানোর জন্য ল্যান্ডফিলে চলে আসতে হয় এবং তারা কাজশেষে বাড়ী ফেরে দুপুর ৩-৪টায়। এর ফলে তাদের অবুঝ শিশুরা নানা ধরণের বর্জ্য সামগ্রী নিয়ে ঐ সময় খেলায় মেতে থেকে নানান ক্ষতির শিকার হয়।*

*"টোকাই" বা "ময়লা কুড়ানী" পরিচয়ে সমাজে মুখ দেখানো যায়না। একটি শিশুর জন্য সমাজে "টোকাই" বা "ময়লা কুড়ানী" পরিচয়টা অত্যন্ড় ঘৃনা ও অবজ্ঞার। শহুরে জনগোষ্ঠী এমনকি বস্ড়িবাসীরাও এই বর্জ্যজীবি বা "টোকাই" বা "ময়লা কুড়ানী"-দের অত্যন্ড় ঘৃনার চোখে দেখে। ময়লা কুড়ানী মেয়েদের কেউ বিয়ে করতে চায়না।*

*একজন সক্ষম বর্জ্যজীবি খুব বেশী হলে সপ্তাহে ৫০০-১৫০০ টাকা আয় করতে পারে যা দিয়ে ৫-৬ সদস্যের পরিবারের খাবার, বাড়ীভাড়া, বিদুৎ ও পানি বিল, যাতায়াত খরচ, শিক্ষা খরচ, চিকিৎসা খরচ ইত্যাদি মেটানো যায়না। ফলে বর্জ্যজীবিরা আজ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই বর্জ্যসংগ্রহে নিয়োজিত শিশু, নারী ও পুর"ষদের জীবনের সংকট-এর বিষয়গুলো রাজনীতিবিদ, পরিকল্পনাকারী, মিডিয়া ও সিভিল সোসাইটির নজরে আসা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। যে সকল অবুঝ শিশুরা বর্জ্যজীবি মায়েদের সাথে ডাম্পিং সাইট ঘুরে বেড়ায় তাদের শারীরিক ও মানসিক সবধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা দিবাযত্নকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যদি আমরা জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুকে বিদ্যালয়ে দেখতে চাই তাহলে প্রতিটি বর্জ্যজীবি শিশুর জন্যও কাজলী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের শিক্ষার সুযোগ তৈরী করতে হবে। সারা দেশের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হলেও মাতুয়াইলে একটি কাজলী মডেল শিক্ষা কেন্দ্র বর্তমানে সেখানকার শিশুদের জন্য আনন্দের সাথে শিক্ষা ও মানবিক বিকাশের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের প্রায় ৭০টি ওয়েষ্ট ডাম্পিং সাইটের প্রতিটিতেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি করে কাজলী মডেল শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হলে বর্জ্যজীবি শিশুরাও শিক্ষার আলো পাবে এবং মুলধারার প্রাথমিক শিক্ষায় অন্র্ড়ভূক্ত হবার একটি পথ খুজে পাবে।*

*বর্জ্যজীবিরা ধারাল বস্তু, বেণ্ডড, টিন, সূই, সিরিঞ্জ বা ভাঙ্গা কাঁচ দিয়ে হাতে বা পায়ে জখম হয় এবং হাসপাতাল ও পচনশীল বর্জ্য দ্বারা সংক্রমিত হয়। ডাম্পিং সাইটে কাজ করার সময় তারা অনেক সময় বর্জ্যবাহী ট্রাক, লেভেলিং মেশিন বা বুলডোজারের সাথে দূর্ঘটনার শিকার হয়। এভাবে অনেকেই অঙ্গহানীর শিকার হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। উপরোক্ত কারনেই তাদের জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরী। বর্জ্যজীবিদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বর্জ্যজীবিদের মধ্যে প্রতিবন্ধীতার হার কমাতে, তাদের সুরক্ষায় ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে সেফটি ট্রেনিং অতি জরুরী। বর্জ্যজীবিদের এই অমানবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন সরকার ও সমাজের সহায়তায় এদের স্বাস্থ্যসহ সব ধরনের ঝুঁকি হ্রাসের ও মানবিক সংকটের সমাধানের জরুরী কার্যকর উদ্যোগ।*

*শহরের পরিবেশ উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন-এর কুপ্রভাব মোবাবেলার স্বার্থেই বর্জ্যজীবিদের বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং এবং এসবের বিপনন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরীর প্রশিক্ষণ ও সার তৈরী এবং এসবের বিপনন-এর ব্যবস্থা করলে দেশের কৃষির উন্নয়ন তরাণ্বিত হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানগুলোর (ইকো-এন্টাপ্রাইজ) সক্ষমতাবৃদ্ধি করে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। বর্জ্য বেচাকেনায় শিশু ও নারীরা নানাভাবে ঠকে। তাই বর্জ্য ব্যাবসা থেকে কিভাবে বর্জ্যজীবি, বর্জ্য ব্যাবসায়ী ও দেশ সবাই লাভবান হতে পারে তা দেখতে হবে। সরকারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ও নীতি যেন এই ৪ লাখ বর্জ্যজীবি মানুষের জীবন, জীবিকা ও মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে না করা হয় এটিই এখন সবার প্রত্যাশা।*

### ১. বর্জ্যজীবি নারী ও শিশু

বর্জ্যজীবি হলো একটি শহুরে জনগোষ্ঠী যারা শহরের ডাষ্টবিন ও ল্যান্ডফিল (আবর্জনার ডাম্পিং সাইট) থেকে বিক্রয়যোগ্য ও পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন শ্রেনীতে আলাদা করে ও বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে তা বিক্রয় করে

থাকে বা নিজেরা ব্যবহার করে থাকে। বর্জ্যজীবিরা বর্জ্য সংগ্রহ ও বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ পেশাটি হলো শহরের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীদের আয় করার একটি স্বাধীন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা। এদের অধিকাংশ মানুষই গ্রামীন দারিদ্রের কারনে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের দ্বারা উদ্বাস্তু হয়ে শহরে এসেছে। বর্জ্যজীবিরা রাস্তার পাশের ডাষ্টবিন এবং ওয়েষ্ট ডাম্পিং সাইট (ল্যান্ডফিল) থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে। অধিকাশ বর্জ্যজীবিরাই ল্যান্ডফিলের নিকটস্থ বস্তিতে বা শহরে গৃহহীন অবস্থায় বাস করে। প্রতিদিনই তারা কাঁধে একটি বস্ড়া এবং হাতে একটি আরচা (একটি লোহার রড যার মাথা বাঁকা) নিয়ে বর্জ্য ঘাটাঘাটি করে প্রয়োজনীয় বর্জ্য খুজে বের করে। বর্জ্যজীবিরা উচ্ছিষ্ট খাবার, কাগজ ও প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল, ছেড়া বা উচ্ছিষ্ট কাপড়, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর বর্জ্য, চুল, টিন ও টিনজাত দ্রব্য, ভাঙ্গা কাঁচ, টিন, লোহার টুকরা, কাঠ, জুতা-স্যান্ডেল, ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া সিরিঞ্জ, রক্ত ও স্যালাইনের ব্যাগ, পণ্ঢাষ্টিক বোতল ও বোতলের কর্ক, ব্রাশ, বলপেন, আইসক্রিমের পট, প্লাষ্টিক পাইপ এবং অন্যান্য প্লাষ্টিকজাত দ্রব্য, এক্সরে পেপার, পলিথিন, রাবারের সামগ্রী, হাড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। বর্জ্য সংগ্রহ করার পর তার গুনগত মান বাড়ানোর জন্য সেগুলো তারা নানাভাবে পরিষ্কার করে বা কখনো কখনো পানি দিয়ে ধোয়ামোছা করে। বর্জ্য সংগ্রহ করে তা পরিষ্কার করার পরই তারা সেগুলো নিয়ে বর্জ্য বিক্রির দোকানে (ভাঙ্গারী/কাগজ/ঝূট-এর দোকান) আসে।

ঢাকা শহরে অনেক শিশুকেই (৫ থেকে ১৮ বছর) আবর্জনা টোকাতে দেখা যায় তাই শিল্পী র'নবী এদের জীবনের বঞ্চনার চিত্র "টোকাই" কার্টুনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। শিশু ও নারীরা বর্জ্য সংগ্রহ ও তা বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের জন্য শহরের ডাষ্টবিনগুলোতে বা ডাম্পিং সাইটে আসে। কেন শিশুরা এ কাজ করছে এ প্রশ্নের উত্তরে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায় যেমনঃ বাবা/মা মারা গেছে তাই তাদের দেখার কেউ নাই, বাবা মাকে ছেড়ে গেছে আর মা তাকে খাওয়াতে পারেনা, মা অন্যখানে বিয়ে বসেছে তাই ঐ ঘরে তার জায়গা নাই, বাবা-মা খাওয়ায় না, বাবা-মা স্কুলে পাঠায় না, মা এখানে ময়লা কুড়াতে আসে তাই আমি তার সাথে আসি, ময়লা বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায় আর বেঁচে থাকা যায়, গার্মেন্টস-এ আমাকে কাজে নেয়না, এই কাজ স্বাধীনভাবে করা যায় আর এখানে সুপারভাইজারের চোটপাট নাই ইত্যাদি।

বর্জ্যজীবি নারীরা দারিদ্রের জন্য বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ভোগ করে, যেমনঃ খাদ্য ক্রয়ের অর্থের অভাব, রোগশোকে চিকিৎসাসেবা গ্রহন ও ঔষধ ক্রয়ে অক্ষমতা, নিজেদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অক্ষমতা, নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সমস্যা এবং স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি। পর্যবেক্ষণকালে আরও দেখা গিয়েছে যে এই বর্জ্যজীবি নারী ও পুর"ষরা মূলত বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী বা রোগাক্রান্ড় এবং তাদের শরীর নিয়মিত ও নিয়ম মেনে কোন কাজ করার উপযোগী নয় তাই তারা এধরণের অনানুষ্ঠানিক কিন্তু ঝূকিপূর্ণ কাজ করছে। বর্জ্যজীবিরা উপরোক্ত কারনগুলোর জন্য আজ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে তারা অনেকটাই অক্ষম।

## ২. দেশে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমান এবং এর সাথে সর্ম্পকিত জীবন ও জীবিকা

ঢাকাসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনগুলো, জেলা ও উপজেলা শহরগুলোতে নগরায়ন বাড়ার সাথে সাথে বর্জ্য উৎপাদনও ক্রমবর্ধমানহারে বাড়ছে। প্রতিদিন ঢাকার মাতুয়াইলের মৃধাবাড়ীস্থ ল্যান্ডফিল, মিরপুরের বইলারপুর ল্যান্ডফিল এবং ২০০০ টি ডাষ্টবিনে আনুমানিক ৪৫০০ টন বর্জ্য আসে, চট্টগ্রামের ২ টি ল্যান্ডফিলসহ ১৭০০টি ডাষ্টবিনে প্রায় ৭৬০ টন বর্জ্য আসে, রাজশাহীর ১টি ল্যান্ডফিলসহ ২০টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশনে আনুমানিক ৪০০ টন বর্জ্য আসে, খুলনার ২টি ল্যান্ডফিলসহ ১২০০টি ডাষ্টবিনে আনুমানিক ৩০০ টন বর্জ্য আসে, বরিশালের ১টি ল্যান্ডফিলসহ ২০০টি ডাষ্টবিন ও ২৫টি বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে দিনে প্রায় ১৮০ টন বর্জ্য আসে, সিলেটের ২টি ল্যান্ডফিলসহ ৮২টি ডাষ্টবিনে আনুমানিক ২৫০ টন বর্জ্য আসে, এছাড়া বাকী ৫৮ জেলা শহরের প্রতিটিতে গড়ে ১টি করে ল্যান্ডফিল ও ৩০ টি করে ডাষ্টবিন রয়েছে যেখানে গড়ে দৈনিক ১৫০ টন বর্জ্য আসে। ঠিক এরকমই দেশের ৫০৮টি উপজেলায় নগরায়ন বাড়ার সাথে সাথে বর্জ্যও বাড়ছে এবং সেই সাথে এই ছোট ছোট শহরগুলো গড়ে দৈনিক প্রায় ২০টন বর্জ্য তৈরী করছে কিন্তু এ শহরগুলোর কোথাও ডাষ্টবিন ও ল্যান্ডফিল আছে আবার কোথাও নেই। তাই দেখা যাচ্ছে দেশের শহরগুলোতে এখন কমপক্ষে গড়ে দৈনিক ২৭,০০০ টন বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে এবং ১০,০০০ এর বেশী ডাষ্টবিন রয়েছে এবং উপজেলা শহরগুলো বাদে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরগুলোতে কমপক্ষে ৭০টি ওয়েষ্ট ডাম্পিং সাইট রয়েছে। সব পৌরসভা বা উপজেলা শহরগুলো এখনও বর্জ্য ফেলার স্থান নির্দিষ্ট করতে পারেনি।

রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস বাংলাদেশের সহায়তায় পরিচালিত অন্য এক গবেষণায় গিয়েছে যে প্রায় চার লাখ মানুষ বর্জ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ সব মানুষ জীবিকার জন্য বাসাবাড়ী, শিল্প-কলকারখানা, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান, ক্লিনিক ও হাসপাতাল, ডাষ্টবিন ও ডাম্পিং সাইট থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার পর তা শ্রেনীবিন্যাস করে, প্রক্রিয়াজত করে এবং তারপর বর্জ্য বিক্রির দোকানে তা বিক্রি করে। ক্ষতিকর ও দূর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ঠিক জায়গামত নিয়ে ফেলা এবং রিসাইক্লিং-এ এসব মানুষদের অবদান অসামান্য। ২০০৯ সালে রিসাইক্লিং করা পণ্ঢাষ্টিক বোতল রপ্তানী করে দেশের ১৩০ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। সাম্প্রতিক এক জাতীয় পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ঢাকায় দৈনিক সৃষ্ট ৪৫০০ মেট্রিক টন বর্জ্য থেকে প্রায় পৌনে দুই লাখ বর্জ্যজীবি প্রতিদিন ৮০০ টন বর্জ্য সংগ্রহ করে যার মূল্য বৎসরে দাড়ায় ৩৫০০ হাজার কোটি টাকা।

মাতুয়াইল ডাম্পিং সাইটে ভোর ৫টা থেকে সিটি কর্পোরেশনের প্রায় ২০০ ট্রাক পর্যায়ক্রমে এসে আবর্জনা ফেলতে শুরু করে এবং একটি ট্রাক একাধিকবার আবর্জনা ফেলতে আসে। একদিকে ট্রাকগুলো আবর্জনা ফেলে এবং বুলডোজারগুলো আর্বজনা সমান করতে (লেভেলিং) থাকে আর একইসাথে শত শত শিশু-কিশোর-কিশোরী-নারী-পুরুষ এক হাতে আরচা ও অন্য হাতে

বর্জ্য সংগ্রহের বস্তা হাতে নিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের প্রতিযোগীতায় নেমে পরে। এ রকম বর্জ্য ফেলা ও সংগ্রহ করা চলতে থাকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

## ৩. বর্জ্যজীবি, সামাজিক ঘৃণা ও বৈষম্যের শিকার এক জনগোষ্ঠী

বর্জ্যজীবিরা সবাই বলে যে "ময়লা কুড়ানী" পরিচয়ে সমাজে মুখ দেখানো যায়না। একটি শিশুর জন্য তার বস্তিতে বা সমাজে "টোকাই" বা "ময়লা কুড়ানী" পরিচয়টা অত্যন্ড় ঘৃনা ও অবজ্ঞার। শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীও এই "বর্জ্যজীবি" বা "টোকাই" বা "ময়লা কুড়ানী"-দের অত্যন্ড় ঘৃনার চোখে দেখে। বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কিশোরীরা সাধারণত কর্মরত অবস্থায় নিজেদের ছবি তোলার অনুমুতি দেয়না কারন এই ছবি পত্রিকায় ছাপা হলে বা টেলিভিশনে দেখালে তাদের গ্রামবাসী ও প্রতিবেশী বা আত্নীয়রা জেনে যাবে যে তারা "ময়লা কুড়ানী"। আর ময়লা কুড়ানীকে কেউ বিয়ে করতে চায়না। উপরন্তু, যারা ময়লা কুড়ায় বা বর্জ্যজীবি তাদের সমাজের সবাই এমনকি বস্তিতে বসবাসকারী বাসাবাড়ীর কাজের বুয়া, দিনমজুর বা রিকসাওয়ালাও তাদের সাথে কথা বলেনা বা সর্ম্পক রাখে না।

## ৪. বর্জ্যজীবি শিশুদের শিক্ষা পরিস্থিতি

অধিকাংশ বর্জ্যজীবি নারীই তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যাক্তা বা কোন প্রতিবন্ধী বা মাদকসেবীর স্ত্রী। বর্জ্যজীবি অধিকাংশ নারীরই ৩-৪টি শিশু রয়েছে। এধরণের সংসারে পরিবারের জন্য নারীকেই আয় করতে হয় । সাধারণত দেখা যায় যে, অনেক নারীই ৩-৪ টি সন্ড়ানসহ ল্যান্ডফিলে বর্জ্য কুড়াতে আসে। বর্জ্য ফেলার স্থানে বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত নারী-পুরুষরা তাদের শিশুদের সাথে না রাখতে চাইলেও কোন বিকল্প ব্যাবস্থা নেই কারন তারা যখন বর্জ্য সংগ্রহের কাজে আসে তখন তাদের ঘরে শিশুদের দেখাশোনা করার কেউ থাকেনা। ঘরে যেহেতু এই শিশুদের কেউ দেখাশোনা করার নেই তাই এই নারীদের ঐ ৩-৪টি শিশুসহই ভোর ৫টার মধ্যে বর্জ্য কুড়ানোর জন্য ল্যান্ডফিলে চলে আসতে হয় এবং তারা বাড়ী ফিরে যায় দুপুর ৩-৪টায়। শিশুদের জন্য সরকারী বা বেসরকারী স্কুল খোলে সকাল ৮টায় কিন্তু তখন বেশী সংখ্যায় সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনার ট্রাকগুলো বর্জ্য ফেলতে থাকে এবং শত শত শিশু-নারী-পুরুষের ট্রাক ও বুলডোজারের আশেশাশে বর্জ্য কুড়ানো ধুম পড়ে যায়। এই ব্যস্ড় সময়ে শিশুদের স্কুলে নিয়ে যাবার কোন সুযোগ আর মায়েদের থাকেনা। তিন-চারটি শিশুসহ কেউ এরকম একজন নারীকে চাকরী দিতে চায় না বা চাকরী নেওয়াও সম্ভব নয় কারন কাজের সময়ওতো ঐ শিশুগুলোকে তার নিয়োগকর্তা তার সাথে রাখতে দিবেনা যদিও ঐ শিশুদের সবসময়ই তার নজরের মধ্যে রাখতে হবে। এর ফলে প্রতিটি শিশুই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ডাম্পিং সাইটে এসে এই ছোট ছোট অবুঝ শিশুরা নানা ধরণের বর্জ্য সামগ্রী নিয়ে ঐ সময় খেলায় মেতে থাকে আর যেসব শিশু একটু বুঝতে শিখেছে যে আকর্ষনীয় কোন বর্জ্য সংগ্রহ করার চেষ্টায় থাকে যাতে সে ওটা বিক্রি করে তার আকর্ষনীয় খাবারটি কিনে খেতে পারে। এভাবেই ছোট ছোট শিশুরা পড়ালেখা না শিখে বর্জ্য সংগ্রহের কৌশলগুলো ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করে।

## ৫. বর্জ্যজীবি মানুষদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি

ডাম্পিং সাইটে ট্রাকে করে বর্জ্য ফেলার পর ক্ষতিকর বর্জ্য, হাসপাতাল বর্জ্য, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য, পচা ও বাসী গৃহস্থলী বর্জ্য, মানুষ ও পশুর মলমূত্র সব মিলেমিশে এক চরম ক্ষতিকর পদার্থের সমাহার হয়। তাই ডাম্পিং সাইটে গিয়ে বর্জ্যজীবি মানুষগুলো বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্য ও ভয়াবহ রোগ-জীবানু দ্বারা ক্ষতির শিকার বা সংক্রমিত হবার মারাত্নক ঝূকির মধ্যে পরে। বর্জ্যজীবিরা যখন বর্জ্য সংগ্রহ করতে ডাম্পিং সাইটে কাজ করে তখন তারা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে বিভিন্নভাবে জখম ও ক্ষতির শিকার হয় যেমনঃ ধারাল বস্তু, বেণ্ডড, সূই, ভাঙ্গা কাঁচ, সংক্রামক জৈব বর্জ্য, হাসপাতাল বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, ক্ষতিকর রাসায়নিক ইত্যাদি। শহরের ডাষ্টবিনেই বিভিন্ন ধরণের হাসপাতাল বর্জ্য যেমনঃ জীবানুযুক্ত রক্ত, শরীরের বিভিন্ন ধরনের তরল পর্দাথ, কেটে ফেলা শরীরের অংশ, সূঁই, বেণ্ডড, সিরিঞ্জ এসব ফেলা হয় ফলে এসব দূষিত ও সংক্রামক জিনিষগুলো দ্বারাই বর্জ্যজীবিরা জখম হয় বা বিভিন্ন রোগে সংক্রমিত হয়। এভাবে রোগাক্রান্ড় হয়ে তারা প্রায়শই আমাশয়, ডায়েরিয়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস, চর্মরোগসহ বিভিন্ন ধরণের রোগে ভোগে। ডাম্পিং সাইট থেকে ফেরার পর শিশুরা ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, মাথাঘোড়ানো ভাব ইত্যাদিতে ভুগতে থাকে। তাদের হাত-পা প্রতিদিনই কয়েকবার করে বিভিন্ন ধরণের ধারাল বস্তু দিয়ে কেটে যায় কিন্তু তারা এসব জখমের জন্য কোন সুচিকিৎসা গ্রহন করেনা তাই তাদের এই ক্ষতগুলো ধীরে ধীরে পচনের দিকে যায়। তাদের যেহেতু এধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কোন ভাল চিকিৎসাকেন্দ্র বা চিকিৎসকের কাছে যাবার সুযোগ ও সামর্থ নেই তাই তারা স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তার বা ঔষধের দোকান থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকে। বর্জ্যজীবিদের প্রায় সবাই নিরক্ষর এবং তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাই তাদের কোন মাধ্যমে থেকেই স্বাস্থ্য শিক্ষা পাবার কোন সুযোগও নেই।

বর্জ্যজীবি শিশু যারা সব সময়ই ডাম্পিং সাইট ও ডাষ্টবিনের আশেপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকে এবং দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করার কারনে হাত না ধুয়েই এবং হাজার হাজার মাছির মধ্যে বসেই খাওয়া দাওয়া করে তাই তারা ডায়েরিয়ায় বেশী ভোগে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রচন্ড দূর্গন্ধের মধ্যে বসবাসের কারনে তারা প্রায় সবসময়ই গ্যাষ্ট্রিকে ভোগে। ডাম্পিং সাইটে কাজ করার সময় তারা অনেক সময় বর্জ্যবাহী ট্রাক ও লেভেলিং মেশিন বা বুলডোজারের সাথে দূর্ঘটনার শিকার হয়। এভাবে অনেক শিশুরই অঙ্গহানি হয়ে চিরতরে তারা পঙ্গু হয়ে যায়।

তাদের সবসময়ই নুয়ে থেকে বর্জ্য খোজ করতে ও সংগ্রহ করতে হয় এবং বর্জ্যের উপর নুয়ে থেকে হাটার কারনে সব ধরণের দূগন্ধ তাদের নাক দিয়ে ঢুকতে থাকে। এ ধরনের ঝূকিঁপূন শ্রমের জন্য বর্জ্যসংগ্রহকারীরা সবসময়ই মাথাব্যাথা, মেরুদন্ড ও ঘাড়ে ব্যাথায় ভোগে। শরীরের সবখানে ব্যাথা, বমি বমি ও মাথাঘোরা ভাব, রুচিহীনতা ও নিদ্রাহীনতার কারনে তারা সপ্তাহের

প্রতিদিন কাজ করতে পারেনা। একদিন কাজ করলে পরদিন আবার কাজে যাওয়া অনেকেরই সম্ভব হয়না। বর্জ্যজীবিদের প্রায় সবাই খালিপায়ে ও খালিহাতে বর্জ্য সংগ্রহ করে। পা দুটোকে রক্ষার জন্য কখনো কখনো পায়ে তারা কুড়িয়ে পাওয়া পনস বা খোলা স্যান্ডেল পরে বর্জ্যের উপর দিয়ে হাটে যা তাদের পা দুটোকে বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা করার জন্য খুবই অনুপযোগী। তারা বর্জ্য সংগ্রহের সময় মাস্ক পরে না। তারা নাকে ও মুখে মাস্ক পরে না, হাতে গণ্ডাভস পরেনা বা পায়ে ভারী বুট জুতা পরেনা কারন এগুলো তাদের কাছে অস্বস্তিকর ও ভারী মনে হয়। হাতে গণ্ডাভস পড়লে তারা দ্রুততার সাথে নির্দিষ্ট বর্জ্যটি ধরতে পারেনা বরং খালি হাতেই দ্রুত ধরা যায়। তারা আরও মনে করে যে হাতে গ্লাভস পড়লে ও পায়ে ভারী জুতা থাকলে তারা শত শত নারী-পুরুষের মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহের প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়বে।

## ৬. কাজলী মডেল শিশু শিক্ষাকেন্দ্রঃ বর্জ্যজীবি শিশুদের শিক্ষা ও আশ্রয় কেন্দ্র

বাংলাদেশের ৭০টি ওয়েষ্ট ডাম্পিং সাইটের প্রতিটিতেই প্রয়োজন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি করে কাজলী মডেল শিক্ষা কেন্দ্র যাতে বর্জ্যজীবি শিশুরাও শিক্ষার আলো পায় এবং মুলধারার প্রাথমিক শিক্ষায় অর্ন্তভূক্ত হবারও সুযোগ সৃষ্টি হয়। সারা দেশের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হলেও মাতুয়াইলে একটি কাজলী মডেল শিক্ষা কেন্দ্র বর্তমানে সেখানকার শিশুদের জন্য শিক্ষা ও মানবিক বিকাশের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা মডেল হলো দরিদ্র বান্ধব ও কম খরচে আনন্দের মাধ্যমে শিখতে পারার একটি কার্যকর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মডেল। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০০ টি কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কম খরচে ও স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহনে প্রতিবছর প্রায় ৮০০০ শিশুকে আনন্দের সাথে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে।

রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস বাংলাদেশের সহায়তায় এবং গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক পরিচালিত বর্জ্যজীবি শিশুদের জন্য মাতুয়াইলে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কাজলী মডেল শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি মাতুয়াইলের শিশুদের নানাভাবে উপকারে এসেছে যেমনঃ শিশু-নারী-পুরুষ সব বর্জ্যজীবিরাই বিশ্বাস করতে পারল যে বর্জ্যজীবি শিশুদের জীবনেও শিক্ষা সুযোগ পাওয়া সম্ভব, বর্জ্যজীবি মা যারা তার ছোট ছোট শিশুকে নিয়ে প্রতিনিয়ত বর্জ্য ফেলার স্থানে আসে তারা এখন ঐ কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটিতে নিরাপদে তাদের শিশুকে রাখার সুযোগ পেল এবং শিশুরা যারা মা-বাবা-ভাইবোনের সাথে ডাম্পিং সাইটে সারাদিন রোদে পুরত, বৃষ্টিতে ভিজত বা খালি পায়ে ক্ষতিকর বর্জ্যের উপর দিয়ে হেটে জখম হতো বা রোগাক্রান্ড় হতো এবং প্রচন্ড দূর্গন্ধে হাটাহাটি করে শরীর ও মন খারাপ হতো সে শিশুরা একটা নিরাপদ ঠিকানা পেল। কাজলী কেন্দ্রে আনন্দের সাথে বর্ণমালা, শব্দাবলী, সংখ্যা, সাধারণ হিসাব শেখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ ও নৈতিকতা সর্ম্পকেও তারা শিখছে। এ রকম আরও কাজলী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র যদি এই বর্জ্যজীবি শিশুদের জন্য সারদেশের ৭০টি ডাম্পিং সাইটে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আরও অনেক শিশু মানবিক বিকাশের একটি পথ খুঁজে পাবে।

কাজলী মডেল অনুযায়ী সমাজের মানুষই নিজেরা চাঁদা তুলে বা চাল-ডাল-তরকারী-তেল নিজের বাড়ী থেকে সংগ্রহ করে এক এক শিশুর মা এক এক দিন মাসের ২৬ দিন একবেলা খাবার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু বর্জ্যজীবি মায়েরা ভোর ৫ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ড় কাজে ব্যস্ড় থাকায় এবং খুবই দরিদ্র হওয়ায় তারা শিশুদের খাবারের দ্বায়িত্ব নিতে পারেনা। সরকার বা সমাজের কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান বর্জ্যজীবি এই শিশুদের একবেলা খাবারের জন্য দ্বায়িত্ব নিতে পারে।

## ৭. উপসংহার ও সুপারিশমালা

বর্জ্যসংগ্রহে নিয়োজিত শিশু ও মায়েদের জীবনের সংকট-এর বিষয়গুলো সরকার, রাজনীতিবিদ, পরিকল্পনাকারী, মিডিয়া, সিভিল সোসাইটি ও সাধারণ মানুষের নজরে আসাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৬ বছরের নীচে যে অবুঝ শিশুরা বর্জ্যজীবি মায়েদের সাথে ডাম্পিং সাইটে ঘুরে বেড়ায় তাদের আশ্রয়ের জন্য এবং দূষণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা দিবাযত্নকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মায়েরা যখন বর্জ্য সংগ্রহে ব্যস্ড় থাকবে তখন তাদের ছোট ছোট শিশুরা আশ্রয়কেন্দ্রে থাকবে যেটি হবে একটি সেবাযত্ন ও শিক্ষা কেন্দ্র। মাতুয়াইলের ডাম্পিং সাইটে ভোর ৫ টায় বর্জ্যজীবি নারী ও শিশুরা হাজির হয় আর ৩-৪টার দিকে বাড়ী ফেরে। এই ১১-১২ ঘন্টা তারা এই নোংরা পরিবেশেই থাকে। এই শিশুদের জন্য যে বিদ্যালয় ও দিবাযত্নকেন্দ্র থাকবে সেটিকে অবশ্যই সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ড় খোলা রাখা জরুরী। এর সাথে বর্জ্যজীবি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের শিক্ষার সুযোগ তৈরী করতে হবে।

খেলা আর আনন্দের মাঝে শিখতে পারার সুযোগ বর্জ্যজীবি শিশুদের জীবনে আসেনা বললেই চলে। কাজলী মডেলের খেলার মাধ্যমে শেখাটা মাতুয়াইলের সব বর্জ্যজীবি শিশুরই ভীষণ পছন্দ। তাই এ সুযোগ বাংলাদেশের বর্তমান ৭০টি ওয়েষ্ট ডাম্পিং সাইটে সম্প্রসারিত করা ও টিকিয়ে রাখা জরুরী যা সরকারের ভিশন ২০২১ ও এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

বর্জ্যজীবিদের এই অমানবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন সরকার ও সমাজের সহায়তায় এদের স্বাস্থ্যসহ সব ধরনের ঝুঁকি হ্রাসে ও মানবিক সংকটের সমাধানে জরুরী উদ্যোগ। বর্জ্যজীবি শিশুরা প্রতিনিয়তই ধারাল বস্তু, বেণ্ডড, টিন, সূই, সিরিঞ্জ বা ভাঙ্গা কাঁচ দিয়ে হাতে বা পায়ে জখম হয় এবং হাসপাতালের ও পচনশীল বর্জ্য দ্বারা সংক্রমিত হয়। শিশুরা এটিকে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে এবং বর্জ্য সংগ্রহের কাজের ঝুঁকি বা রোগের জীবাণুতে সংক্রমিত হবার বিষয়টি তারা জানে না। বর্জ্যজীবি নারী ও শিশুসহ সবাইকে বর্জ্যসংগ্রহের কাজে ঝুঁকিগুলো জানাতে হবে এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাবস্থা করতে হবে। যে কোন স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য এদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাবস্থা ও রেফারেল সুবিধা থাকতে হবে। উপরোক্ত কারনেই

বর্জ্যজীবিদের জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরী। বর্জ্যজীবিদের সুরক্ষায় ও তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর জন্য সেফটি ট্রেনিং দিতে হবে।

ডাম্পিং সাইটে বর্জসংগ্রহকারীদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি বা ল্যট্রিন-এর ব্যবস্থা নেই। পুরুষরা যদিওবা কোথাও না কোথাও উন্মুক্ত স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারে কিন্তু এটি কিশোরী বা নারীদের জন্য অসম্ভব। বর্জ্যজীবিদের নিরাপদ পানি খাবার ব্যাপারে সুযোগ ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বর্জ্যজীবিদের বিশেষত নারী বর্জ্যজীবিদের স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বর্জজীবিরা যদিও অনেক কষ্ট করে বর্জ্য সংগ্রহ করে কিন্তু তারা সেগুলো বিক্রি করতে গিয়ে বর্জ্য ব্যাবসীদের দ্বারা চরম শোষণের শিকার হয়। বর্জ্যজীবিরা সাধারণত বর্জ্যের প্রকৃত বাজার দর জানেনা তাই তাদের অনেক কমদামে সেগুলো বিক্রি করতে হয়। বর্জ্য বিক্রির ক্ষেত্রে দরকষাকষির সুবিধার্থে তাদের সমবায় গড়ে তুলতে সহায়তা করাও প্রয়োজন।

সঠিকভাবে বর্জ্য রিসাইক্লিং ও পুনরায় ব্যবহার করতে পারলে দেশের কয়েক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরী করে দেশের পরিবেশ বান্ধব সারের চাহিদার একটি বড় অংশ পুরণ করা ও জাতীয় কৃষি উন্নয়ন সম্ভব। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্জ্য রিসাইক্লিং ও পুনঃ ব্যবহার করার কৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা উচিৎ এবং এ ক্ষেত্রে বর্জ্যজীবিরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। তাই বর্জ্যজীবিদের বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং এবং এসবের বিপণনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরীর প্রশিক্ষণ এবং এসবের বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্জ্যজীবিদের সেফটি ট্রেনিং দেয়া, স্বাস্থ্যসেবা দেয়া, বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য পুনঃব্যবহার ও রিসাইক্লিং করা, প্রতিটি ডাম্পিং সাইটে শিশু শিক্ষার কেন্দ্র খোলা, বর্জ্য থেকে জৈর সার তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ দেবার দ্বায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে নিতে হবে।

বর্জ্যভিত্তিক পরিবেশবান্ধব সংগঠন (বাড়ী বাড়ী থেকে গৃহস্থলী বর্জ্য সংগ্রহের মহল্লা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, ভাঙ্গারী দোকান, ঝূট ব্যবসার দোকান, ভাঙ্গা কাঁচ, লোহা ও টিনের দোকান, চুলের দোকান, হাড়ের দোকান) যেগুলো আছে সেগুলোর সক্ষমতাবৃদ্ধি করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় রেখে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে।

বর্জ্যজীবিরা সংগৃহীত বর্জ্য স্থানীয় বর্জ্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। ঢাকা শহরের যাত্রাবাড়ী, কাঁটাসূর, মিরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে এ ধরণের বর্জ্য ব্যাবসায়ীরা রয়েছে। রিসাইক্লিং একটি বড় ব্যাবসা। এই বড় ব্যাবসার বড় শোষনের শিকারও হয় এই শিশু ও নারীরা। বর্জ্য বেচাকেনায় শিশু ও নারীরা নানাভাবে ঠকে। কিভাবে দোকানদারের সাথে দরকষাকষি করে ভাল মূল্য পাওয়া যায় তা বিবেচনায় আনতে হবে। তা না হলে অধিকতর সময় শিশুকে বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত থাকতে হবে। বর্জ্য ব্যবসা থেকে যাতে বর্জ্যজীবি ও ব্যবসায়ী সবাই লাভবান হতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ও নীতিতে যেন এই ৪ লাখ বর্জ্যজীবি মানুষের জীবন, জীবিকাকে ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো যাতে উপেক্ষিত না হয় এটিই আমাদের প্রত্যাশা। প্রত্যাহিক জীবনে তৈরী হওয়া বর্জ্য ও বর্জজীবি মানুষ এ দুটিই আমাদের দেশের উন্নয়নের সাথে সর্ম্পকিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই জাতীয় স্বার্থেই এ বিষয়ে জনগন, সরকার, উন্নয়নকর্মী, গবেষক সবাইকে চিন্ড়া করতে হবে।